বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)

বর্ষ-০৯ সংখ্যা-০১
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

নিউ হ্যাম্পশায়ার ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র এর গবেষকদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে অনুষ্ঠিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় FoCaS কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ৩ জুন হতে ১৭ জুলাই ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ার এবং ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ভিজিটিং ফেলো প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। ইউএসএআইডি'র (USAID) কম্পাস (Compass) প্রোগ্রামের আওতায় ইউএস ফরেস্ট সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামস (USFS-IP) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ার (UNH) এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে Forestry and Climate Science Visiting Fellows Program 2023 (FoCaS-VEP) বিষয়ক একটি বিনিময় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রোগ্রামটি পরিচালিত হয়। ছয় সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যে ছিল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, এবং জলবায়ু বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এ কার্যক্রমটি সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ লাইফ সায়েন্স অ্যান্ড এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টির ডিন Dr. Anthony S. Devis। এ কার্যক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর নির্বাচিত প্রার্থীগণ ফেলো হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ কার্যক্রমের আওতায় UNH এর ফ্যাকাল্টি অধ্যাপক/পরামর্শদাতাদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন, গবেষণা কার্যক্রম এবং Good Practice পর্যবেক্ষণের কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ল্যাবরেটরি রয়েছে যা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় অত্যাধুনিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে দক্ষ মানব শক্তি তৈরির পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত প্রত্যেক ফেলোবৃন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি পরামর্শদাতাদের (অধ্যাপক) সাথে কাজের সুযোগ ছিল। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম হতে নির্বাচিত ফেলো রিসার্চ অফিসার জনাব লায়লা আবেদা আক্তার Professor Heidi Asbjornsen এবং Post Doc Fellow Mauro Brum এর তত্ত্বাবধানে খরা মোকাবিলা সম্পর্কিত গবেষণার অভিজ্ঞতার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের নির্দেশনায় পরিচালিত গবেষণায়, বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ পরিমাপের কৌশল এবং এর মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত গবেষণার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে বৃক্ষের

পানি পরিবহনের সক্ষমতা, এমবোলিজম, পানি সঞ্চালন ক্ষমতা, পাতার পরিবাহিতা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো মূল্যায়ন করা যা বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সম্পর্কিত গবেষণা কাজ পরিচালনায় সহায়ক হবে।

ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা ফিল্ড পরিদর্শন এ কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। এ কার্যক্রমের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত ছাত্র স্যাম জুকারম্যান খরার জন্য বৃক্ষ প্রজাতি এবং বনের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য থম্পসন ফার্মে গবেষণা পরিচালনা করছেন। ভিজিটিং ফেলোগণ বৃক্ষ প্রজাতি এবং বন উভয়ের নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রিটমেন্ট এর সাইটগুলোতে তাঁর গবেষণা প্রোটোকলগুলো পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় বন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মৎস্য গবেষণায় Linas Kenter এর জলজ ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম জনপ্রিয় Striped Bass মাছের প্রজনন ক্ষমতা ও চাষাবাদ বৃদ্ধিতে গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণও এ প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত ছিল। এছাড়াও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফ্যাকাল্টি Dr. Gregg এর গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয় এবং সেখানে কীভাবে ম্যানগ্রোভ এলাকা থেকে অগার দিয়ে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হয় এবং বিভিন্ন সাইটে মাটি ও পানির মানের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় সে বিষয়গুলো পরিদর্শন করানো হয়। সামুদ্রিক গবেষণা ল্যাব এবং অ্যাকোয়াফোর্ট, যেখানে সামুদ্রিক মাছ গবেষণা কার্যক্রম এবং সমুদ্রে জলজ ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হয় তা পরিদর্শন করানো হয়।

পাশাপাশি UNH কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষামূলক প্লট যেমন হার্বার্ট ব্রুক, বার্টলেট ফরেস্ট, ওয়াটারসেড ম্যানেজমেন্ট এবং দীর্ঘমেয়াদী সিলভিকালচারাল গবেষণার জন্য একটি রোল মডেল গবেষণা প্লট পরিদর্শন করানো হয়। গবেষণা প্লটটি নিউ হ্যাম্পশায়ারের বনের গঠন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য উক্ত পরীক্ষামূলক প্লটগুলো একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া নিউ হ্যাম্পশায়ারে অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষি খামার এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় Pick Your Own কৌশলটি একটি অভিনব ও জনপ্রিয়, কৌশলটির সাথে পরিচিত করানো হয়, যেখানে কোনো রকম মধ্যস্থতাকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই ক্রেতা সরাসরি খামারির কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারে। কৌশলটি বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছয় সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ওয়াশিংটন ডিসিতে, ইউএসএফএসের প্রধান কার্যালয়ে। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এছাড়া উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. রফিকুল হায়দার, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বনবিদ্যা বিভাগের অনুষদ প্রধানগণ, FoCaS ফেলো, শিক্ষার্থী, USFS, USAID, UNH এবং Compass প্রোগ্রাম এর এশিয়া প্যাসিফিক প্রোগ্রাম ম্যানেজার Justin Green সহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়া USFS-এর পরিচালক Valdis Mezainis এবং সহযোগী প্রধান Angela Coleman USFS-এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। ছয় সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠানে USFS এর প্রতিনিধিবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব উল্লেখ করেন এবং পরিদর্শন কর্মসূচির প্রশংসা করেন। নিউ হ্যাম্পশায়ারে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের উপর Alexandra Hatch এর তৈরি একটি তথ্য চিত্র উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। এ কার্যক্রমটি যেমন দুই দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে দৃঢ় বন্ধন তৈরি করবে এবং তেমনি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতামূলক গবেষণা কাজের সুযোগ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

উৎস: লায়লা আবেদা আক্তার, রিসার্চ অফিসার, সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

দুই পাখাযুক্ত ফল/বীজ

তেলশুর বীজ/ফল

সিভিট বীজ/ফুল

পরিপক্ব বৈলাম বীজ/ফল

পাখা ছাঁটা অবস্থায় বৈলাম বীজ/ফল

ফল বা বীজ হলো বৃক্ষপ্রজাতির বংশবৃদ্ধির প্রথম ও প্রধান ধারক। প্রজাতিভেদে আকার, প্রকার ও নানা রকমের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বীজ উৎপাদন হতে দেখা গেছে। এই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো বীজসমূহকে প্রাকৃতিক নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকতে সহায়তা করে থাকে। আমরা জানি যে, সফল বনায়নের পূর্বশর্ত হলো মানসম্পন্ন বৃক্ষরোপণ সামগ্রী (Quality Planting Material) ব্যবহার অর্থাৎ নির্বাচিত বৃক্ষপ্রজাতি বা মানসম্পন্ন বীজের উৎস (Quality Seed Source) থেকে বীজ সংগ্রহ করা এবং সেই বীজ থেকে নার্সারিতে সঠিক উপায়ে উত্তোলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চারা দিয়ে বনায়ন করা। দেখা গেছে সুষ্ঠু চারা উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বীজের এই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোই আবার বাঁধার

নার্সারি বেডে অঙ্কুরোদগমের পর সদ্য জগানো plumule ও radicle বৈলাম বীজ

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। Dipterocarpaceae পরিবারভুক্ত বেশকিছু প্রজাতিসমূহের ফলকে two-winged fruit বা দুই পাখাযুক্ত ফল বলা হয়। এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য প্রজাতিগুলো হলো তেলসুর, শাল, বৈলাম, তেলিগর্জন, ধলিগর্জন, বইট্টাগর্জন, সিভিট ইত্যাদি। উক্ত প্রজাতিগুলোর উইং বা পাখা থাকার কারণে পরিপক্ক ফল/বীজসমূহ মাতৃগাছের নিচে পাওয়া গেলেও খুব সহজে এরা বাতাসে উড়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে যায়। দেখা গেছে অন্যান্য অনেক বৃক্ষপ্রজাতির মতো এদের কিন্তু সফল প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম দেখা যায় না অর্থাৎ এদের কখনো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত বনায়ন পাওয়া যায় না।

Two-winged fruit বা দুই পাখাযুক্ত ফল জাতীয় এই প্রজাতিসমূহের বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় পাখা বা উইং এর কারণে এদের অঙ্কুরোদগম এর পর সদ্য গজানো plumule ও radicle এর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এতে সুস্থ ও সঠিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। নার্সারিতে সীডবেডে বীজ বপনের আগে পাখাগুলোকে ছেঁটে ছোটো করে নিয়ে তারপর সঠিক নিয়মে প্রজাতিভেদে পলিব্যাগে অথবা সীডবেডে বীজগুলো বপন করতে হবে। বপন পরবর্তী নিয়মিত পরিচর্যা যেমন– পানি দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা ইত্যাদি করতে হবে। প্রজাতিভেদে বীজসমূহের অঙ্কুরোদগম হতে শুরু করলে এদের plumule ও radicle যখন বের হয় তখন সেগুলো নানাভাবে বেড়ে ছড়িয়ে থাকে। আর এই সময়টাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে এদের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বীজের দুই পাশ থেকে বের হওয়া দুটো অংশ যেমন একটিকে বলে plumule, যাকে উপরের দিকে রাখতে হবে এবং অন্য অংশকে বলে radicle, একে বেডের মাটির নিচে ঢুকিয়ে দিতে হয়। পরবর্তীতে plumule অংশ থেকে কাণ্ড ও radicle অংশ থেকে মূল উৎপন্ন হয়। এভাবে নার্সারির সীড বেডে সুষ্ঠু পরিচর্যা করার কারণে এদের অঙ্কুরোদগম হার ও পরবর্তী চারা বেঁচে থাকার হার ৮০-৯০% পর্যন্ত পাওয়া যায়।

উৎস: বীজবাগান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বাঁশের নতুন ০৩ (তিন)টি জাত উদ্ভাবন

উদ্ভাবিত বাঁশের নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র

গত ৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বীজ বোর্ড বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত বাঁশের তিনটি নতুন জাত বিএফআরআই ব্যাম্বু বিবি১, বিএফআরআই ব্যাম্বু বিএন১ এবং বিএফআরআই ব্যাম্বু বিএস১ কে নিবন্ধন প্রদান করে এবং ইনব্রিড ধরনের জাত হিসেবে সারা দেশে চাষের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। গবেষণা সংস্থাটির ইতিহাসে এটিই প্রথম উদ্ভাবনের ঘটনা। এর ফলে বর্তমানে দেশীয় প্রজাতির বাঁশের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪০টি। জাতীয় বীজ বোর্ডের সচিব ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগের মহাপরিচালক মো. আবু জবাইর হোসেন বাবলু এবং প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ড. মো. আকতার হোসেন স্বাক্ষরিত নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্রে নতুন প্রজাতির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, বাঁশের চারা তৈরি বা চাষ অনেক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কোনো কোনো প্রজাতির বাঁশের ফুল আসতে ২০ হতে ৬০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। এজন্য বর্তমানে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা হচ্ছে। বৃহৎ পরিসরে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা তৈরির জন্য বিএফআরআই ১৯৯১ সাল থেকে টিস্যু কালচার ল্যাব চালু করে। আর এ আধুনিক পদ্ধতিতে বরাক, মাকলা ও করজবা বাঁশের চারা তৈরি করতে গিয়ে নতুন তিনটি প্রজাতির উদ্ভাবন করেন গবেষকরা। বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের গবেষকরা ২০০২ সালে বরাক বাঁশের টিস্যু কালচার প্রটোকল সম্পন্ন করেন। পরে ২০০৪ সালে মাকলা বাঁশ এবং ২০০৫ সালে করজবা বাঁশের টিস্যু কালচার প্রটোকল সম্পন্ন করেন। গবেষকরা লক্ষ্য করেন, নতুন জাতের এই বাঁশের চারাগুলোর রূপগত (মরফোলজিক্যাল) বৈশিষ্ট্য মূল প্রজাতি থেকে আলাদা। ২০০৫ সালে গবেষকরা পাবনা, রাজশাহী বিশ্ববদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এবং বান্দরবানে মাঠ পর্যায়ে নতুন এই জাতগুলোর চারা পরীক্ষামূলকভাবে রোপণ করেন। বাঁশের জাতগুলো সফলভাবে বেড়ে ওঠার পর নতুন প্রজাতি হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং জাতগুলোর নাম দেওয়া হয় বিবি১ (বরাক বাঁশ থেকে), বিএন১ (মাকলা বাঁশ থেকে) এবং বিএস১ (করজবা বাঁশ থেকে)। বাঁশের নতুন জাতগুলো কাঠের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং দেশব্যাপী অধিকহারে বাঁশ চাষে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং অর্থনীতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় উঁচু ও ফাঁকা স্থানে উপকূলীয় কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বাঁশ প্রজাতির প্রবর্তন

চর নজির, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালীতে উত্তোলিত বাংলা বাঁশের পরীক্ষামূলক বাগান

বাঁশ পুনঃ উৎপাদনশীল গৌণ বনজ সম্পদ। একটি বাঁশ পরিপক্ব হতে ৩-৫ বছর সময় লাগে। পক্ষান্তরে বৃক্ষ প্রজাতির ক্ষেত্রে (কাঠ উৎপাদন) তা কমপক্ষে ১৫-২০ বছর সময় লাগে। সে হিসেবে বৃক্ষ প্রজাতির তুলনায় বাঁশের আবর্তনকাল অনেক কম। বাংলাদেশের বনভূমি কমে যাওয়া, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি কারণে বাঁশের চাহিদা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে তুলনায় বাঁশের উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ২১-৫৫ বছর বয়সের প্রায় ১,২৬,০০০ হেক্টর কেওড়া বন ও ফাঁকা ভূমি আছে। এসব বন এবং ভূমি উঁচু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া জোয়ারের পানি দ্বারা বছরের খুব কম সময় প্লাবিত হয়ে থাকে। সমগ্র উপকূলীয় এলাকার এসব উঁচু হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের ফাঁকা স্থানে বাঁশ প্রজাতির চাষ করে বনের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। বাঁশের মাটি ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি। ভূমির ক্ষয়রোধে বাঁশের ভূমিকা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন হার অনেক বেড়ে গিয়েছে। বাঁশের কার্বন ধরে রাখার ক্ষমতা অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া বাঁশের ভূমিতে অনুজীবের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। বাঁশ অনেক পাখি ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপকূলীয় বনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উঁচু ও ফাঁকা হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বাঁশ প্রজাতি টিকে থাকতে পারে কিনা তাঁর উপর একটি গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ ২০১৭ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করে। কেওড়া বনের অভ্যন্তরে উঁচু ও ফাঁকা হয়ে যাওয়া ভূমি যেখানে জোয়ারের পানি ৩-৫ মাস প্লাবিত হয় এমন স্থানে মিনি মাউন্ডের (ছোট ঢিবি) উপর বাঁশের ২টি প্রজাতি যথা: বাইজ্জা (*Bambusa vulgaris*) এবং বরাক (*Bambusa balcoa*) এর পরীক্ষামূলক বাগান উত্তোলন করে সফলতা পাওয়া গেছে। মিনি মাউন্ড (ছোট ঢিবি) এর উপরে উত্তোলিত বাঁশের প্রজাতির মধ্যে ৩ বছর বয়সি বাইজ্জা বাঁশের বেঁচে থাকার হার গড়ে ৮৭% পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া বাইজ্জা বাঁশের কোঁড়ল গজানো হারও সন্তোষজনক। প্রতিটি ঝাড়ে বছরে গড়ে প্রায় ৫টির উপরে নতুন কোঁড়ল গজিয়েছে। এদের গড় উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কেওড়া বনের সমতল ভূমিতে উত্তোলিত বাইজ্জা বাঁশের বেঁচে থাকার হার শতকরা ৬০ ভাগ পাওয়া গেলেও কোঁড়ল গজানোর হার খুব কম পাওয়া গেছে। তাছাড়া গড় উচ্চতা ২ মিটারের কাছাকাছি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে বরাক বাঁশের বেঁচে থাকার হার মিনি মাউন্ডে ২২ ভাগের মতো পাওয়া গেছে এবং বর্ধনহার তেমন ভালো পরিলক্ষিত হয় নাই।

উৎস: প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ, বিএফআরআই, বরিশাল।

ঔষধিগুণে ভরপুর গন্ধভাদালি

গন্ধভাদালি Rubiaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লতানো গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Paederia foetida* L. এর ইংরেজি নাম Chinese Moon-creeper বা Kings Tonic. এর বহুবিধ ঔষধি গুণ রয়েছে। এটি বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও নেপালের সর্বত্র দেখা যায়। গন্ধভাদালি সাধারণত লতানো গাছ, এটি সাধারণত অন্য গাছে বেয়ে ওঠে। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চলে এটি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বিক্ষিপ্তভাবে দেশের অন্যত্রও জন্মে। এটি চেনার বিশেষ উপায় হলো এর লতা-পাতায় উৎকট গন্ধ থাকে। এজন্য এর অপর নাম পুতিগন্ধ। এটি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বহুবর্ষজীবী ১.৫ থেকে ৭ মিটার লম্বা লতানো উদ্ভিদ। এর মূল কাষ্ঠল। লতানো কাণ্ড ও পাতার গায়ে সূক্ষ্ম লোম আছে। পাতা, লতার সাথে বিপরীতমুখী হয়ে গজায়, আকারে ছোটো পান পাতার মতো। পত্রবৃন্ত লম্বা,

গন্ধভাদালি

পাতার গোড়ার দিক গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকার, আগার দিক চিকন এবং অগ্রভাগ চোখা, রং সবুজ ও শিরাগুলো স্পষ্ট। ফুল ছোটো, নলাকার বা ফানেল আকৃতির, রোমশ। পাপড়ি ৫টি বিস্তৃত, ত্রিভুজাকার থেকে ডিম্বাকার। রং ফ্যাকাসে বেগুনি, বেগুনি, ধূসর গোলাপি বা ধূসর সাদা। ফল অনেকটা গোলাকার, রং চকচকে বাদামি। বর্ষাকালে এর লতা ও পাতা বেশি বাড়ে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফুল হয় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল পাকে। বীজ বা লতার কাটিং এর সাহায্যে এর বংশ বিস্তার সম্ভব হলেও শিকড়সহ লতার অংশবিশেষ তুলে লাগালেও চারা হয়। গন্ধভাদালির প্রধান ব্যবহার আমাশয় বা পেটের অসুখে। আমাশয়ে গন্ধভাদালির পাতার রস ২-৪ চামচ একটু গরম করে ৮/১০ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খেলে সেরে যায়। শিশুদের পেটের অসুখে, পেট ফাঁপায় এর পাতার রস দারুণ কাজ করে। হাতে বা পায়ের শিরা সংকুচিত হলে পাতা বেটে তিলের তেলের সাথে মিশিয়ে গায়ে মাখলে উপকার পাওয়া যায়। এর পাতার রসের সাথে এক কোয়া রসুন চিবিয়ে খেলে ২/৪ দিনের মধ্যেই বাতের যন্ত্রণা লাঘব হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যে গন্ধভাদালি পাতার রস সকালে সামান্য লবণের সাথে মিশিয়ে খেলে সেরে যায়। কাঁচা হলুদের সাথে ২ চামচ গন্ধভাদালি পাতার রস মিশয়ে খেলে ২/১ দিনের মধ্যে অর্শ রোগের উপশম হয়। দাঁতের ব্যাথায় এর ফল খুব উপকারী। পাতার জলীয় নির্যাস পাথর গলিয়ে দেয় ও মূত্র বর্ধক হিসেবে কাজ করে।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ-সর্পগন্ধা

সুস্থ ও সবলভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আদিকাল থেকেই মানুষ রোগ উপশমের জন্য উদ্ভিদরাজি থেকে খুঁজে নিয়েছে প্রয়োজনীয় গুল্মলতাটি। পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্য থেকে মানুষ গবেষণার মাধ্যমে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে অসংখ্যা উপকারী ঔষধি উদ্ভিদ। জেনেছে ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার ও গুণাগুণ। উদ্ভিদসমূহ তাই মানবজাতির সেবায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে প্রতিনিয়ত। সর্পগন্ধা এমনি এক ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ যা মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাচীনকাল হতে। এটা Apocynaceae পরিবারের অন্তর্গত বহুবর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Rauwolfia serpentina* (L.) Benth.*ex* Kurz ভারতীয় উপমহাদেশে এটার ব্যবহার প্রায় ৪০০০ বছর পূর্ব থেকে। প্রাচীন মানুষ এটার মূল পোকামাকড় ও সাপের কামড়ে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করতো বলে জানা যায়। জার্মান উদ্ভিদবিদ Leonard rauwolfia এই উদ্ভিদটি পশ্চিমা দেশসমূহে প্রথম পরিচিত করেন এবং ১৬শ শতকে তার নামে ইহার নামকরণ করা হয়।

সর্পগন্ধা ঔষধি গাছ

যদিও সর্পগন্ধার আদি নিবাস ওয়েস্ট ইন্ডিজ তথাপি সমগ্র ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর বিস্তৃতি দেখা যায়। এটা সাধারণত ৭৫ সে. মি. থেকে ১ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এটা রোমশ উদ্ভিদ। শাখা প্রশাখা হয় না। পাতা লম্বাটে, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজ, শীতকালে পাতা ঝরে যায়। পুষ্প শ্বেত বর্ণের প্রায় ২.৫৪ সে. মি. লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ড লালচে এবং অনেক ফুল একত্রে থাকে। ফল জোড়ায় হয় বা একটি করেও থাকে। ফল পাকলে কৃষ্ণবর্ণ বা গাঢ় বর্ণের হয়। এর মূল ধূসর বা পীতবর্ণের এবং লম্বালম্বি ফাটলযুক্ত। কাঁচা মূলের গন্ধ কাঁচা তেঁতুলের মতো এবং মূল কিছুটা তিক্ত স্বাদের। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল ধরে। ট্রপিক্যাল এবং সাবট্রপিক্যাল আবহাওয়া এর বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। হিউমাস সমৃদ্ধ নাইট্রোজেন এবং জৈব পদার্থযুক্ত মাটি সর্পগন্ধা চাষের জন্য অনুকূল। সাধারণত বীজের মাধ্যমে সর্পগন্ধার বংশবিস্তার করা হয়। জুলাই হতে অক্টোবর পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহের পর দু-তিন দিন রোদে শুকিয়ে পাঁচ-ছয় মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বীজ লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে চারা অংকুরিত হয়। কাণ্ড ও মূলের কাটিং এর মাধ্যমেও ইহার বংশবৃদ্ধি করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ এই ভেষজ উদ্ভিদটির ব্যবহার আজ বিশ্বব্যাপী এবং এটা মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কার্যকর অবদান রেখে চলেছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি এটা আয়ুর্বেদিক, ইউনানী এবং হার্বাল মেডিসিন তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রধান ব্যবহৃত অংশ হলো মূল, অনেক ক্ষেত্রে পাতা ও গাছের রসও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সর্পগন্ধা থেকে উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ Reserpine এবং Deserpine তৈরি হচ্ছে, যা উচ্চ রক্তচাপ রোধে অত্যন্ত কার্যকর। এর মূলের রস নিদ্রাকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কালাজ্বর এবং পেটের ব্যথায় সর্পগন্ধা বেশ উপকারী। ডায়রিয়া এবং আমাশয় রোধে ইহা বেশ ফলদায়ক। সাপে এবং বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে এটা বেশ কার্যকর। স্নায়ুবিক বিভিন্ন সমস্যায় এবং মানসিক নানা রোগের চিকিৎসায় এটা ব্যবহৃত হয়। ত্বকের সমস্যাতেও এটা ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত উপকারিতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সর্পগন্ধার মতো মূল্যবান ভেষজটি আমাদের দেশের জন্য কতটা জরুরি। দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে যথা: দিনাজপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় প্রাকৃতিকভাবে কিছু পরিমাণ সর্পগন্ধা জন্মায়। আমাদের দেশে এর ব্যাপকভাবে কোনো চাষাবাদ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ু সর্পগন্ধা চাষের জন্য খুবই সহায়ক। ইহা ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং সর্পগন্ধাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় কার্যকরী অবদান রাখার পাশাপাশি নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেও অর্জন করা যেতে পারে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা এবং পরিবেশ রক্ষায়ও ইহা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উদ্ভিদ সংরক্ষণের বিকল্প নেই

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের জীবন উদ্ভিদের সাথে সম্পর্কিত। মানব জাতির উন্মেষ থেকেই উদ্ভিদ ক্ষুধার অন্ন ও রোগের ঔষধ দিয়ে আসছে। অন্ন ও চিকিৎসা ছাড়াও ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরি, যোগাযোগ, বিনোদন প্রভৃতি কাজে মানুষ, উদ্ভিদ (গাছপালা) ব্যবহার করে আসছে। সভ্যতার বাহক কাগজ একটি উদ্ভিদজাত সামগ্রী। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ বিভিন্নভাবে বন তথা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কেবল মানুষই নয়, সমস্ত প্রাণীজগত খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশের জন্য গাছপালা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। জনসংখ্যার ক্রমাগত চাপ, দ্রুত নগরায়ণ, কৃষির সম্প্রসারণ, শিল্পের বিকাশ এবং নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে পৃথিবীর উদ্ভিদ সম্পদ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (FAO) প্রকাশিত এবং বিভিন্ন জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায়, গড়ে প্রতি মিনিটে ৫০ একর করে বন ধ্বংস হচ্ছে এবং প্রতিবছর ১১ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি উজার হচ্ছে। এভাবে বন ধ্বংসের ফলে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে মরুময়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে, বৃষ্টিপাত কমছে, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে; ভূমির তথা মাটির পানিধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে; ভূমি ক্ষয় বাড়ছে। বর্ষার সময় বন্যার প্রকোপ বাড়ছে আর শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান ধারায় বৃক্ষসম্পদ উজাড় হতে থাকলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের বনভূমি ২৫-৪০% শেষ হয়ে আসবে এবং অচিরেই প্রায় ৪০,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি বিলীন হয়ে যাবে। গাছপালা কমে যাওয়ার ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যপ্রাণী (Wildlife) ও মানুষের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। এভাবে পরিবেশ ধ্বংস ও দূষণের ফলে ক্রমশ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিজগৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ২,৫০,০০০ (আড়াই লক্ষ) উদ্ভিদ প্রজাতির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, সৃষ্টির প্রথম থেকে মানুষ ৮০ হাজারের বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে আবাদী (চাষযোগ্য) খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের তালিকা প্রায় ১৫০ টিতে সীমিত হয়ে পড়েছে। আজকের ধ্বংসলীলার ফলে অনেক গাছপালা বিজ্ঞান জগতে পরিচিতি লাভের পূর্বেই আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে কোনো প্রজাতিতে genetic diversity বেশি থাকে। বাস্তবিক অর্থে প্রকৃতি ও বনাঞ্চল হচ্ছে সবচেয়ে সমৃদ্ধ জিন সংরক্ষণাগার। সুতরাং আমাদেরও ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের প্রয়োজনে উদ্ভিদ সম্পদ তথা জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity সংরক্ষণ করতে হবে।

বহুবিধ কারণে আমাদের এই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য অতি দ্রুত কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো লোকসংখ্যার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি ও জলবায়ুর আকস্মিক পরিবর্তন। কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাস উপযোগী একটি আবাসস্থল দিতে চাইলে এখনি সকল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। উদ্ভিদ সংরক্ষণ বলতে বোঝায় উদ্ভিদ সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে একই সাথে বর্তমান যুগের চাহিদা মেটানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সহজভাবে বলতে গেলে বর্তমানে কাঠের প্রয়োজন হলে গাছ কেটে কাঠ আহরণ করার সাথে সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররাও যেন এমনিভাবে প্রয়োজন হলেই গাছ কেটে কাঠ আহরণ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নামই উদ্ভিদ সংরক্ষণ। কাজেই একটি গাছ কাটার আগে অন্তত দুটি গাছ লাগাতে হবে।

ভিসিএফ, খাগড়াছড়ি

উদ্ভিদ সংরক্ষণের উপায়: উদ্ভিদ সংরক্ষণ প্রধানত দুটি উপায় বা পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে যথা: স্ব-স্থানে সংরক্ষণ (In situ Conservation) এবং অন্য স্থানে সংরক্ষণ (Ex-situ Conservation)

স্ব-স্থানে সংরক্ষণ (In situ Conservation): কোনো উদ্ভিদ প্রজাতি বা জীববৈচিত্র্যকে তার আসল বাসস্থানে বা প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণ করার নামই স্ব-স্থানে সংরক্ষণ। ন্যাশনাল পার্ক, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বন, ইকোপার্ক, গেম রিজার্ভ ইত্যাদি সৃষ্টি করে উদ্ভিদ প্রজাতিকে তাদের স্ব-স্থানে সংক্ষণ করা যায়।

অন্যস্থানে সংরক্ষণ (Ex-situ Conservation): কোনো উদ্ভিদ প্রজাতি তার আসল বাসস্থানের বাইরে জীবন্ত সংরক্ষণকে বলে অন্য স্থানে সংরক্ষণ। সীড ব্যাংক সৃষ্টি, লিভিং জিন ব্যাংক সৃষ্টি, টিস্যু সংরক্ষণ, ডিএনএ ও পরাগরেণু সংরক্ষণের মাধ্যমেও এক্স-সিটু সংরক্ষণ করা যায়। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার লক্ষ্য নিয়ে উদ্ভিদ সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ৫ অক্টোবর ফ্রান্স ও ইউনেস্কো মিলিতভাবে International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশই-এ সংস্থার সদস্য। এটি বর্তমানে ছয়টি কমিশনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভিদ প্রজাতি gene resource ও ecosystem রক্ষার্থে নতুন নতুন জিন ব্যাংক, উদ্যান সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক অবস্থানে উদ্ভিদ সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা, বিলুপ্তির আঙ্কা ও ধ্বংসের পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশে আগ্রাসী প্রজাতির প্রভাব

স্থানীয় এলাকার বাইরে থেকে আসা যেসব বহিরাগত প্রজাতি স্থানীয় বাস্তুসংস্থান ও প্রতিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব তৈরি করছে, সেসব প্রজাতিকেই আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি (Invasive Alien Species) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতিগুলো স্থানীয় প্রাণবৈচিত্র্যের অপরাপর সদস্য প্রজাতিকে জোর করে সরিয়ে দেয়। বহিরাগত আগ্রাসী প্রজাতির কারণে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রতিযোগিতায় একটা পর্যায়ে দেখা যায় স্থানীয় প্রজাতিগুলো আর টিকতে পারে না এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে বাধ্য হয়। এভাবে দেখা যায় একটি আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি স্থানীয় বাস্তুসংস্থানের ভেতর একক প্রভাব বিস্তার করে এবং স্থানীয় প্রজাতিবৈচিত্র্য কমে আসে। আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির আগ্রাসনে সতেরো শতক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০ ভাগ স্থানীয় প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। বাংলাদেশে উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে আগ্রাসী বিদেশি জাত আনয়নের ক্ষেত্রে কখনোই দেশের বাস্তুসংস্থান ও প্রাণবৈচিত্র্যের বিস্তারের কথা বিবেচনা করা হয়নি। আকাশমনি, ইউক্যালিপটাসের মতো আগ্রাসী জাতগুলো প্রশ্নহীনভাবে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়েছে। ধীরে ধীরে এসব আগ্রাসী গাছের আগ্রাসনে আমাদের স্থানীয় প্রাণবৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়েছে এবং প্রকৃতি, স্বাস্থ্য এবং জনজীবনে পড়ছে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব। আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি আনয়ন, বর্ধন, রোপণ, ব্যবহার, বিস্তার এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোনো ধরনের কার্যকর জাতীয় নীতিমালা ও আইন না থাকায় এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পথ হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে বিদেশি ব্যবসায়ী ও পর্যটকেরা এসেছেন। তাঁরা সঙ্গে করে এনেছেন নিজেদের দেশের শস্য, ফল ও লতাগুল্মের বীজ। এ পর্যন্ত এ ধরনের প্রায় ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। একই সঙ্গে তাঁরা আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকাও তৈরি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জন্মায় এমন বিদেশি উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ৬৯টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো স্থানীয় প্রজাতির জন্য বড় বিপদের কারন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জোট আইইউসিএন বিশ্বের ১০০টি শীর্ষ আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা তৈরি করেছে। তাতে ওই ৬৯টি প্রজাতির সবকটির নাম রয়েছে। এর মধ্যে কচুরিপানা, আসাম লতা, লজ্জাবতী, ল্যান্টেনার মতো ব্যাপকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধরে রাখতে হলে কোন প্রজাতির বৃক্ষ ও প্রাণীগুলো আমাদের দেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর, তা জানতে হবে। বাংলাদেশে ৬৯টি আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে ৫১ শতাংশই মারাত্মক আগ্রাসী, ৩৬ শতাংশ আগ্রাসী ও ৯ শতাংশ আগ্রাসী হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন প্রজাতির। এসব প্রজাতির মধ্যে ২৮টি প্রজাতি উত্তর আমেরিকা থেকে, ১৭টি প্রজাতি এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে, ৯টি প্রজাতি আফ্রিকা থেকে ও ৭টি প্রজাতি আস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩৮টি প্রজাতির গাছ এসেছে স্বাধীনতার আগে।

কোনো ধরনের পরিবেশগত সমীক্ষা, যাচাই ও ন্যূনতম অনুমোদন ছাড়াই এসব আগ্রাসী প্রজাতি দেশে আনা হয়েছে। ফলে আজ বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগ্রাসী গাছের তলায় ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না, আশেপাশে কোনো ফল গাছ থাকলে সেখানে ফল ধরে না। এমনকি দেখা গেছে ধানের ক্ষেতের আশেপাশে কোনো আগ্রাসী গাছ থাকলে সেখানে ফলন কমে যায়। মাটির তলা থেকে আগ্রাসী গাছের শেকড় বিপুল পরিমাণে পানি টেনে নেয় এবং যেখানে আগ্রাসী গাছ লাগানো হয়, সেখানে অন্য কোনো গাছ খাদ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। আগ্রাসী

ল্যান্টেনা

গাছে কোনো পাখি বসে না। বন্যপ্রাণীদের জন্য কোনো খাবার তৈরি করতে পারে না আগ্রাসী গাছ। আগ্রাসী গাছগুলোর জ্বালানিও ভালো নয়, এমনকি এসব গাছ কাঠ হিসেবেও ব্যবহার করা যায় না। আগ্রাসী বৃক্ষপ্রজাতি কৃষিজমির উর্বরতা ও পানি প্রাপ্তির হার কমিয়ে দিয়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘ প্রণীত আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদের (সিবিডি ১৯৯২) ৮ (জ) নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষ রাষ্ট্রগুলো স্থানীয় বাস্তুসংস্থান, আবসস্থল ও প্রাণবৈচিত্র্যের বিভিন্ন সদস্যের জন্য ক্ষতিকর আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির আনয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও বাতিলের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। একই সনদের ১৪নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় প্রাণবৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এরূপ যেকোনো প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণের জন্য বাধ্যতামূলক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করা, জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা, চুক্তিবদ্ধ পক্ষ রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদের ৮নং সিদ্ধান্তে আগ্রাসী প্রজাতি সম্পর্কিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। সনদের ১০নং পরিচালনা নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোনো আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতি প্রবর্তন ও আনয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃক নির্বাচিত জাতীয় প্রাণবৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদন থাকতে হবে। আগ্রাসী প্রজাতি আনয়নের আগে স্থানীয় এলাকায় এর প্রতিবেশ ও পরিবেশগত প্রভাব যাচাই ও মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এসব আগ্রাসী প্রজাতির বৃক্ষ ও প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে দেশীয় প্রজাতিগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমানে দেশে 'ডেভেলপিং বাংলাদেশ ন্যাশনাল রেড লিস্ট অফ প্লান্টস অ্যান্ড ডেভেলপিং ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাটেজি অফ এলিয়েন স্পিসিজ অফ প্লান্টস ইন সিলেক্টেড প্রোটেক্টেড এরিয়াস' শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৫টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল যেমন: হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান, কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, রেমা-কেলেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এর মধ্যে ১৭টি বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে সকল সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ সমগ্র দেশে জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির একটি তালিকা তৈরি এবং এদের কৌশলগত ব্যবস্থাপনার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পরিবর্তিত বিপন্ন আমাদের একমাত্র প্রিয় পৃথিবী আবারও প্রাণ ফিরে পেতে পারে আগ্রাসী নয়, কেবল স্থানীয় প্রাণবৈচিত্র্যের বিকাশের মাধ্যমেই।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

বাঁচুক প্রকৃতির বন্ধু হাতি

ডাঙায় বাস করা সবচেয়ে বড় এ প্রাণীটির নাম আমরা সবাই জানি। সারা পৃথিবীতে দুই প্রজাতির হাতি রয়েছে। এদের একটি হলো এশীয় হাতি এবং অপরটি আফ্রিকান হাতি। হাতির এই প্রজাতির মধ্যে এশীয় হাতির অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। বিশ্বের ১৩টি দেশ যেমন: বাংলাদেশ, ভারত, ভূটান, নেপাল, মায়ানমার, চীন, লাওস, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ায় এশীয় হাতি দেখা যায়। এক জরিপে দেখা গেছে, এদের সংখ্যা ৩৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার। এদের অধিকাংশেরই বাস ভারতীয় উপমহাদেশে। বাংলাদেশের মধুপুর গড় থেকে শুরু করে বৃহত্তর ময়মনসিংহের গারো পাহাড়, শালবন, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরহরিৎ বন, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী এলাকায় একসময় হাতির অবাধ বিচরণ ছিল। কিন্তু বাসস্থান ধ্বংস, বন উজাড়, খাদ্যের অভাব ও চলাচলের পথে বাঁধার কারণে আমাদের দেশে হাতির অবস্থা শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেছে। হাতি আজ আমাদের দেশের একটি মহাবিপন্ন প্রাণী। বর্তমানে হাতি শুধু চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরহরিৎ বনে অল্প কিছু টিকে আছে। আমাদের দেশে বন্য অবস্থায় হাতির সংখ্যা মাত্র ১৯২ থেকে ২২৭টি। এ ছাড়া প্রায় ৮৩ থেকে ১০০টি হাতি পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের আরাকান ভারতের আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে আসা যাওয়া করে।

হাতি বেশ সামাজিক প্রাণী। স্ত্রী হাতিগুলো তাদের বাচ্চাদের নিয়ে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। পুরুষ হাতি শুধু প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী হাতির দলে যোগ দেয়। প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর পরপর স্ত্রী হাতি একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করে থাকে এবং পুরো জীবদ্দশায় প্রায় ১০-১২টি বাচ্চা জন্ম দেয়। একটি হাতি ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। হাতির গর্ভধারণকাল ১৮-২০ মাস। এরা ঘাস, লতা-পাতা, বাকল, ফল-মূল ইত্যাদি খায়। এদের দৃষ্টিশক্তি কম, কিন্তু ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি প্রবল। বিশাল এসব হাতির চারপাশে দরকার বিশাল বনভূমি। কিন্তু আজ মানুষের বিবেকহীন উন্নয়ন, নিষ্ঠুরতার জন্য মানুষের প্রতিবেশী অনেক জীবের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। আকারে বড় হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে হাতি। প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়, বন্য হাতিগুলো লোকালয়ে ঢুকে মানুষের ঘরবাড়ি ক্ষতি করছে। ফসল নষ্ট করে ফেলছে। ফলে দু-একটা হাতি আহত কিংবা মারা পড়ছে। এ ছাড়া দাঁত, চামড়া ও মাংসের জন্য প্রতিবছর গোপনে বন্য হাতি নিধন তো চলছেই।

হাতি রক্ষার ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আমাদের দেশ থেকে অচিরেই হারিয়ে যাবে এই প্রাণী। তবে আশার কথা হলো প্রকৃতির এই জীব হাতিকে রক্ষার জন্য আইইউসিএন, বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। ২০০১ সাল থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশে এশীয় হাতি সংরক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে হাতির সংখ্যা জরিপ, হাতির জন্য হুমকিগুলো চিহ্নিতকরণ, হাতির আবাস ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, হাতি মানুষ দ্বন্দ্ব, হাতি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা বিষয়ে কাজ করছে। এছাড়া বন বিভাগের সহায়তায় ময়মনসিংহ, কক্সবাজার জেলার রিভং এলাকা, টেকনাফের দমদমিয়ায় হাতি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কাজ হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, হাতি সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণ ও ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, হাতির খাবার হিসেবে পরিচিত গাছপালা রোপণ, হাতি নষ্ট করবে না এমন অর্থকরী ফসল চাষের উদ্যোগ গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে হাতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বীজের বিস্তারে হাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া হাতিকে বলা হয় আমব্রেলা স্পিসিস। কারণ, একটি হাতি বনে ছাতার মতো কাজ করে। অর্থাৎ হাতি যদি বেঁচে থাকে তাহলে বনও টিকে থাকবে। আর একটি বনের টিকে থাকা মানে হাজারও জীববৈচিত্র্যের জীবন বেঁচে যাওয়া ও প্রকৃতির ভারসাম্য ঠিক থাকা। আবাসস্থল ধ্বংস ও হ্রাস, খাদ্য ও পানির অভাব, চলাচলে বাধা, একক প্রজাতির উদ্ভিদ চাষ, হাতির চলাচলে মানববসতি স্থাপন প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে হাতি আজ বিলুপ্তির পথে। বন বিভাগের সহায়তায় দ্য ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন (আইইউসিএন) বাংলাদেশ, প্রকৃতির এই প্রয়োজনীয় প্রাণীটি নিয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। গণ্ডার, বুনো মহিষ, নেকড়েসহ প্রভৃতি প্রাণী এখন আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হাতি যেন সে পথ না ধরে, সে জন্য আমাদের সবাইকে হাতি রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে এবং কাজ করতে হবে সবাইকে।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : ড. রফিকুল হায়দার	- পরিচালক	অসীম কুমার পাল	- আহ্বায়ক
ড. ওয়াহিদা পারভীন	- সদস্য সচিব	মো: এমদাদুল হক	- সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd

ফোন : +৮৮-০২৪১৩৮০৭১৫, +৮৮-০২৪১৩৮০৭০১